লাভের জল লোভের জল

মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

" সভ্যতার বিবর্তনে জলের গুরুত্বের কথা বাদ দিয়ে ইতিহাস লেখার চেষ্টা করা গল্পের বেশির ভাগটাই উহ্য রাখার সামিল । সভ্যতার ইতিহাস অতটা নীরস নয় ।"

—ডোনাল্ড ওরস্টার

ক'দিন আগের এখানকার এক দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ "ইলিশের রাজধানী বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জে ..... ছয় হাজার টাকায় একটি ইলিশমাছ বিক্রি হয়েছে । পদ্মা শুকিয়ে যাওয়ায় ফরিদপুরের ইলিশের সুনাম এখন কেড়ে নিয়েছে বরিশাল । ....." কেন খবরটি উল্লেখ করলাম সেই প্রসঙ্গে যাবার আগে বাংলাদেশের এক নদী বিজ্ঞানী জামাল আনোয়ারের লেখা থেকে কিছু কথা উদ্ধৃত করছি ---- " আজ থেকে একশ বছর পরের একটি দৃশ্যকল্পনাকরুন । দর্শনার্থী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সামনে ঢাকা যাদুঘরের কিউরেটর কিছুদিন পূর্বে বিলুপ্ত ইলিশ মাছের কঙ্কালের অবশেষ দেখাচ্ছেন । একদা অভিনব মর্যাদা সম্পন্ন ওজিভে জল আনা উপাদেয় ইলিশ মাছ ---- সাধারণ বাঙালির ভোজ্য তালিকায় যার উপস্থিতি ছিল হর্ষ উদ্রেককারী — সম্পূর্ণ অবলুপ্ত ।"

পশ্চিমবাংলা এবং বাংলাদেশ উপকূলবর্তী বঙ্গোপসাগরে বসবাসকারী 'অ্যানাড্রোমাউস্' নামক এই বিরল প্রজাতির মাছটি বর্ষায় এবং শীতে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য নোনা ছাড়ার উদ্দেশ্যে গঙ্গা (ভাগীরথী) , পদ্মা ও মেঘনা দিয়ে প্রায় ১০০ কিমি পর্যন্ত উপরের দিকে উঠে আসে । তার কারণ মিষ্টি জলের যে তাপমাত্রায় ইলিশের ডিম থেকে বাচ্চা ফোটে তা একমাত্র ঐ সব অঞ্চলের পদ্মা-মেঘনা এবং ভাগীরথী দিয়ে প্রবাহিত জলধারায় বজায় থাকে বলেই এই সব নদীতে মাছটির প্রাপ্যতা প্রায় একচেটিয়া ছিল । পদ্মা শুকিয়ে যাবার অন্যতম একটি কারণ ফারাক্কা ব্যারাজ । জল দূষণ ইত্যাদি অন্যান্য কারণ সেই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার । আমার আলোচ্যসূচীতে শুধুমাত্র ফারাক্কার নীচে ভাগীরথীর পথে প্রবাহিত গঙ্গার উপকূলের জলের নীরস কথা দু-একটি দিক তুলে ধরব ।

কৈশোরে , ছয় দশককালেরও বেশি আগে বরিশালের আড়িয়ালখাঁর এক শাখা দিয়ে যাত্রা শুরু করে নদীপথে খুলনায় এসে পৌঁছেছিলাম —পথে পড়া সব নদীতেই একবার করে ডুব দিয়েছিলাম । নদীমায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার সেই অনাবিল আনন্দ আজও স্মৃতি-বিধুরিত । তারপর এই ষাট দশককাল নদী বলতে শুধু দূরথেকে দেখা অনুভূতি । মাঝে মাঝে যে গঙ্গার কাছে যাইনি তা নয়, কিন্তু সে তো আর পীযূষপ্রবাহিনি থাকেনি --- "বাণিজ্যলক্ষ্মীর নির্লজ্জ নির্দয়তায়" সে অনেক দিন আগেথাকতেই গরলপ্রবাহিনী । সেই কবে গঙ্গার দুই পাড়ের দুরবস্থায় আতঙ্কিত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন -- "হুঁ ,বলি এই বেলা গঙ্গা মা'র শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু আর থাকছেনা , দৈত্য দানবের হাতে পরে এসব যাবে। ওই ঘাসের জায়গায় উঠবে ইটের পাঁজা ..... ।

যেখানে ছোট ছোট ঢেউগুলো ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে সেখানে দাঁড়াবে পাইপ বোঝাই ফ্ল্যাট , আর সেই গাধাবোট । আর ওই তাল , তমাল , আর নীচুর বং , ওই নীল আকাশ , মেঘের বাহার , ওসব কি আর দেখতে পাবে ? দেখবেপাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে কলের চিমনি ।''

আমার কৈশোরের সেই ফেলে আসা নদী , যৌবন থেকে পরিচিত প্রতিবেশের নদীসমূহ সবই আজ ভয়ংকর দুরবস্থায় । শুধুমাত্র যেগুলোতে নিয়মিত জোয়ার ভাঁটা খেলে সেগুলোর জল ওঠার শেষ সীমা পর্যন্ত নদী নাব্য থাকলেও সেগুলোর জলের গুণাবলী একান্তই নষ্ট হয়ে গেছে । উপর থেকে আসা মিষ্টি জলের প্রবাহ সমুদ্র থেকে আসা নোনা জলের স্রোতে মিশে যে জীববৈচিত্র্যের উপযোগী গুণমান সৃষ্টি করে তা ব্যাহত হলে মাছ , ঐ জলেবেড়ে ওঠাবনভূমি , উভয় জীবের কৃষিজ ফসল সবকিছুই বিপন্ন হয়ে পড়ে । আজ উভয় বাংলার সুন্দরবন ক্রমশঃ সংকীর্ণ,বিধ্বস্ত কৃষি অর্থনীতি । বিলীয়মান ম্যানগ্রোভ সহ বিভিন্ন উদ্ভিদ ও সুন্দরবন অঞ্চলের প্রাণী ।

তাই জলের কথা যতটা সরস মনে হয় , আসলে তা কিন্তু ততো সরস ও সরল নয় । বাঙ্গালীর ইতিহাস লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন -- '' এই কোমল , নরম , নমনীয় ভূমি লইয়া বাঙলার নদনদীগুলি ঐতিহাসিক কালে কত খেলাই না খেলিয়াছে । কত কীর্তি ধ্বংসকরিয়াছে , কত দেশ ভূখন্ডের চেহারা ও সুখ সমৃদ্ধি একেবারে বদলাইয়া দিয়াছে ..... । প্রকৃতির দুরন্ত লীলার সঙ্গে মানুষ সর্বদা আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই । অনেক সময় হার মানিয়াছে , তাহার উপর দূরদৃষ্টিহীন মানুষের দুর্বুদ্ধি । সাময়িক লাভের হিসাব দেখিতে গিয়া জল নিকাশের এক প্রবাহের স্বাভাবিক পথগুলির যথেচ্ছাচারের ত্রুটি করে নাই ; এখনও তাহার বিরাম নাই । '' জল নিয়ে এই দুর্বুদ্ধি , সাময়িক লোভ আর লাভের হিসেবই আমাদের ভাবিয়ে তোলে । মানবসভ্যতা চিরকাল প্রকৃতির নিজস্ব স্পন্দনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এগিয়েছে , যেখানেই তার ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে সেখানেই তার পরিণতি হয়েছে ভয়ংকর ।

লাভ আর লোভের পাল্লায় পড়ে জলের সংকট যে কতটা তীব্র তা পল্লীগ্রামস্থ মানুষ ছাড়া -- বিশেষ করে খরাপ্রবণ পুরুলিয়া , বাঁকুড়া , পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলমহল অংশ , বীরভূমের ঝাড়খন্ড সন্নিহিত অঞ্চলের মানুষ ছাড়া অন্য কারুর পক্ষে সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব নয় । '' যাহারা কেবল কলিকাতাস্থ এবং অন্য নগরস্থ লোকের ..... প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াবঙ্গদেশের শুভাশুভের বিষয় আলোচনা করে ..... তাহারাই বলে অধুনা বাংলাদেশের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে । কিন্তু যে সমস্ত লোক বঙ্গদেশের অন্তর্বর্তী সমস্ত পল্লীগ্রামস্থ মানুষের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া দেখে এবং যাহারা মধ্যে মধ্যেতাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া নানা প্রকার দুঃখের বার্তা শ্রবণ করে তাহারা আর বলিতে পারেনা যে দুর্দশা ভিন্ন কোন অংশেই হার উন্নতি হইয়াছে ।''(১৫০ বছর আগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধের অংশ)। সেই ট্রাডিশন আজও অপ্রতিহত । আর আজও গ্রামের মানুষের মৌলিক দুর্দশার অন্যতম একটি দিক হোল পানীয়

থেকে শুরু করে জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার ব্যবহার উপযোগী জলের নিদারুণ অভাব । বাঁকুড়া , পুরুলিয়া , পশ্চিম মেদিনীপুর ও বীরভূমের কোন কোন অংশে এক কলসি পানীয় জল সংগ্রহের জন্য একাধিক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয় । আর এই কাজে গ্রামীণ মেয়েদের শ্রমকে কোন মানবিক , অর্থনৈতিক বা সামাজিক চর্চায় কতটা মূল্য দেওয়া হয় তা সবারই জানা । অথচ এইসব অঞ্চলের জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ 'সাঁওতাল জনজাতির' মানুষেরা স্বভূমি থেকেউচ্ছেদ হতে হতে কোণঠাসা হয়ে বিগত দেড়শ বছরের মধ্যে (সাঁওতাল জাগরণেরপর) যেসব জায়গায় নতুন করে গ্রাম পত্তন করে থাকতে শুরু করেছিলেন , সেখানেও সবার আগে তাঁরা পানীয় , ধোঁয়া-মাজা-স্নানের জল , গবাদি পশুর ব্যবহারের জল এবং অল্প পরিমাণ সেই ব্যবস্থার জন্য জলের ব্যবস্থা পাকা করে তবে তাঁরা তাঁদের বসবাস বিস্তৃত করেছিলেন । জলকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ব্যবহারের বিধি তাঁদের জানা ছিল । এছাড়া ,'বাংলায় বসবাসকারী সাঁওতালরা খুব সুন্দর পুকুর তৈরি করত ' । সেই সব দিন বিগত । এখন ঐসব অঞ্চলে যেখানেই একটি জলের সংস্থান আছে সেখান থেকে তাঁদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয় সরকারী উন্নয়ন প্রকল্পের নাম করে । বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সারা ভারতে উন্নয়নের নামে প্রায় ৮/১০ কোটি আদিবাসী মানুষ তাঁদের আবাসভূমি থেকে উৎখাত হয়ে কোথায় হারিয়ে গেছেন কেউ বলতে পারেনা ।

জল প্রকৃতিজ , রাজনৈতিক সীমা নিরপেক্ষ , গতিশীল এবং বিকল্পহীন প্রাকৃতিক সম্পদ । প্রয়োজনের তুলোয় ব্যবহারযোগ্য জলের চাহিদার চাইতে যোগান সীমিত । তাই অন্য পাঁচটা বাজারজাত দ্রব্যের মতো জলও একটাপণ্য । অন্যসব আগ্রাসনের রাজনীতির মতোই জলসম্পদকে দখল করার চেষ্টা ও চক্রান্ত ক্রমশ আগ্রাসনে পরিণত হয়েছে । অনেক জল বিশেষজ্ঞের মতে এই শতাব্দীতেই জল নিয়ে ঘটে যাবে বিশ্বযুদ্ধ ; শুধু জল নয় , পরিবেশ-প্রকৃতির উপর সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ , প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা ও আধিপত্যের সাম্রাজ্যবাদী পরম্পরা যা একচেটিয়া কারবারী কর্তৃক দুনিয়ার বাদবাকী মানুষের উপর বিধিনিষেধর চরম সুপরিকল্পিত প্রয়োগ । এই সুজলা সুফলা বাংলারই কোন কোন অঞ্চলে শুখা মরশুমে জল সঙ্কট এমন তীব্র হয় যে সরকারের কাছে অন্ন , বস্ত্র , বাসস্থান , আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নের চাইতেও তা গুরুতর হয়ে পড়ে । আর সাধারণ মানুষের কাছে তখন আওয়াজ ওঠে আগে জল দাও , তারপর ভোট চাও । ঠিক যেমন পশ্চিমভারতের শুখা এলাকার মানুষ পূর্বতন একজন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ভোট চাইতে গেলে বলেছিলেন --- " পহেলে পানি , পিছে আডবাণী । "

বৃষ্টির জল প্রতিটি ফোঁটা সংরক্ষণ জাতীয় পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পাবে এমনটাই বলেছিলেন একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী -- তিনি একথাও বলেছিলেন প্রতিটি গ্রামে পাঁচ শতাংশ জমি জল সংরক্ষণেরকাজে ব্যবহৃত হবে । প্রতিশ্রুতির বন্যার তোড় বন্যার বেগের চাইতে দ্রুত স্মৃতি থেকে নিকাশ হয়ে যায় । চাহিদার তুলনায় যোগানের ঘাটতি যত বাড়ে পণ্যের দাম ততই বাড়ে ---অর্থনীতির এই নিয়ম

জলের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয় । জল এখন প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে বহুজাতিক পণ্যে পরিণত , বিপননে চটকদার মোড়কে দুধের চাইতেও মহার্ঘ । বিশ্বব্যাঙ্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট ই . সেরাজেলডিন ১৯৯৫ সালে বলেছিলেন আগামী শতাব্দীতে বিশ্বযুদ্ধ হবে জল নিয়ে । বাস্তবে সেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে --- তবে তা অর্থনীতির চতুর কৌশলে । একাধিক বহুজাতিক সংস্থা এখন জলের বাণিজ্যে ময় --- রূপালি পর্দার নায়ক-নায়িকা বা খেলার মাঠের আইকনরা সবাই বলছেন --- 'এ দিল মাঙ্গে মোর' , আর আমরা আপামর দেশবাসী সেই বিষ মেশানো ঠান্ডা জল পান করে উল্লসিত : কবির ভাষায় বললে --- 'বাঁচিয়া গিয়াছি বিধির আশীষে অমৃতের টীকা পরি !'

''জল আর জল
চারিদিক শুধু জল ।
কিন্তু , বিন্দুমাত্র তায়
মিটিবেনা কারো পিপাসা । ''--- কোলরিজ

তৃষ্ণা নিবারণ , কৃষিজ ফসল উৎপাদন , জনবসতির ক্রমবিকাশ , শিল্প স্থাপন , বাণিজ্য , সংস্কৃতির প্রসার সব ক্ষেত্রেই জল এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । পৃথিবীর অনেক এলাকা জলাভাবে পরিত্যক্ত বা জনবসতিহীন রয়ে গেছে । জলপথই দূরকে করেছে নিকট বন্ধু , পরকে করেছে ভাই ; আবার আমাদের মতো বহুদেশে ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল জলপথে । তাই জল আর রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্পর্কও অত্যন্ত নিবিড় । জলের পাঠ নিতে তাই তার বিজ্ঞানের সাথে অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্যক উপলব্ধি করতে হবে । ভূ-পৃষ্ঠের ৭১ শতাংশ এলাকা জলময় হলেও পৃথিবীর জনসংখ্যার ২০০ কোটি তৃষ্ণার্ত বাজলবাহিত রোগে অসুস্থ বা মৃত্যুমুখে পতিত হয় । গত শতাব্দীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৬০০ কোটি অতিক্রম করেছে । আর ঐ শতাব্দীর মধ্যে জলের চাহিদা বেড়েছে ৬ গুণ । এক সমীক্ষায় প্রকাশ ২০১৫ সাল নাগাদ পৃথিবীর ৪৬ থেকে ৫২ টি দেশের প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ বাঁচার মতো প্রয়োজনীয় জল পাবেন না । আরো কিছুবিশেষ সংবাদ হোল :

- এখন পৃথিবীতে প্রায় ১২০ কোটি মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল পান না ।
- প্রতি বছর পৃথিবীতে ১.৫০ কোটি শিশু জল বাহিত রোগে মারা যায় ।
- পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হন ।
- পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষের জন্য কোন পরিচ্ছন্ন পয়ঃপ্রণালী নেই । ভারতে প্রায় ১৫ কোটি জনদিন জল আনতে ব্যয় হয়, যার জন্যে ২০০০ সালের আর্থিক মানদন্ডে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষতির পরিমাণ ১০০০ কোটি টাকা ।
- এছাড়া জলবাহিত রোগে অসুস্থতার জন্য নষ্ট হয় ৯ কোটি শ্রম দিবস, যার আর্থিক মূল্য সহজেই অনুমেয় ।

- এ দেশের শতকরা ৮০ শতাংশ শিশু জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হয় এবং বছরে প্রায় ৭ লক্ষ শিশুর সে কারণে মৃত্যু ঘটে ।
- প্রায় ৪.৪০ কোটি মানুষ ফ্লুরাইড , আর্সেনিক , লবণতা বা লৌহকণিকার আধিক্য ইত্যাদি জলদূষণ কারণে অসুস্থ হন ।

পৃথিবীতে গড়ে মিষ্টি জলের ৬৯ শতাংশ কৃষিতে , ২৩ শতাংশ শিল্পে , বাকী ৮ শতাংশ পানীয় বা গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার হয় । ভারতের হিসেবটা হোল ৮৩ শতাংশ সেচে , পানীয় জল হিসেবে চার শতাংশ , বাদবাকী অন্যান্য কাজে । তবুও প্রতি গ্রীষ্মে দেশের অনেক মানুষ পানীয় জল পাননা । কিছু মানুষের কাছে কখনোই জল কোন সমস্যা না হলেও বেশীর ভাগ মানুষের কাছে চিরস্থায়ী সমস্যা । দেশের জনসংখ্যা ক্রমশ ঃ বাড়ছে কিন্তু আমাদের জলসম্পদের পরিমাণ সীমিত তাই মাথাপিছু গড় যোগান ক্রমশ ঃ কমতির দিকে । প্রথম সবুজ বিপ্লবের সময়কাল থেকে আমরা দিশাহীনভাবে আমাদের ভূগর্ভস্থ সঞ্চিত জল টেনে তুলছি । বিপরীতে বৃষ্টির জল সঞ্চয়ের মাধ্যমে তার কত অংশ নবীকরণ হোল সে সম্পর্কে আমরা খোঁজ রাখিনি । বনভূমি নষ্ট হওয়ার একদিকে যেমন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমেছে , অপরদিকে আচ্ছাদনহীন মাটিতে বৃষ্টি পড়ে একদিকে যেমন জল ভূগর্ভে প্রবেশ করার আগেই গড়িয়ে যাচ্ছে , তেমনি ভূমিক্ষয় বাড়িয়ে মাটিকে বন্ধ্যা করে তুলেছে । এছাড়া গাছের আচ্ছাদনহীন মাটি সহজে উত্তপ্ত হবার কারণে বৃষ্টির জল মাটির গভীরে যাবার আগেই বাষ্প হয়ে উবে যাচ্ছে । আয়ের চাইতে ব্যয় বেশী হলে হাতে থাকে যেমন কলম , ভূগর্ভের জলের সঞ্চয় থেকে অনবরত জল তুললে ভূগর্ত তেমনি হয়ে পড়ে শূন্য কুম্ভ । অতিরিক্ত জল তোলা আর বে-হিসেবি খরচ প্রকৃতির উপর ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে । প্রকৃতিকে রক্ষা করে অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে গেলে জল ব্যবহার সীমিত করার পাশাপাশি তার সংরক্ষণ , উন্নয়ন , পুনর্নবীকরণ ইত্যাদি কাজও দক্ষতার সঙ্গে করা প্রয়োজন , তার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠ এবং দৃঢ় একটি জাতীয় জলনীতি ।

আমাদের দেশে ৮০% এর বেশী জলই কৃষিকাজে লাগে । কৃষিনীতি ও জলনীতির স্থিরতা এবং পারস্পরিক সামঞ্জস্যের অভাবে এবং শুধুমাত্র লাভের দিকে মনোনিবেশ করতে গিয়ে আমরা ভুলেই যাই যে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রতিটি ফোঁটা বৃষ্টির জল দিয়ে কত বেশী ফসল আমরা ফলাতে পারি । ভরতুকি দেওয়া বিদ্যুৎ খরচ করে মাটির নীচ থেকে জল টেনে নষ্ট করে কৃষি নয় , যুক্তিসম্মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উপর থেকে বিন্দু বিন্দু ছড়ানো জলে সেচ বা নব ভারতের লুথার বারব্যাংক শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আবিষ্কৃত " ফলিয়ার সার "জাতীয় জল সাশ্রয়কারী গাছের খাদ্য ব্যবহার করে সেচের জলের ব্যবহার পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব । মানুষের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে চাল জাতীয় খাদ্যের

পরিবর্তে, যা উৎপাদন করতে কেজি প্রতি অনেক জলের প্রয়োজন , গম-মিলেট ইত্যাদি জাতীয় খাদ্যে অভ্যস্ত করা যায় তাহলে তার উৎপাদনে একদিকে যেমন জলের সাশ্রয় হবে , তেমনি সুদূর ভবিষ্যতে বাঁচবে জল , বাঁচবে প্রাণ ।

অর্থনৈতিক চমক সৃষ্টি করতে শিল্পের উপর জোর দিতে গিয়ে কম জল ব্যবহারকারী শিল্পভাবনাকে কখনো গ্রাহ্যের মধ্যে আনা হয়নি । বাধ্য করা হয়নি প্রতিটি শিল্পের বর্জ্য জলকে শোধন করেপুনরায়ব্যবহারউপযোগীকরতে । সবচেয়ে বড় কথা বড় শিল্পগুলো যে ভাবে শিল্পের বর্জ্য ঢেলে নদীনালা , পুকুর দীঘির ভাল জলকে দূষিত করছে তাতে ব্যবহার করা জলের কয়েকগুণ জল অকারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । তা অমার্জনীয় অপরাধ ।

গ্রাম এবং শহরের মধ্যে জলের যোগানের পরিমাপটাও চরম বৈষম্যমূলক ও অস্বচ্ছ । আসলে যাঁরা যোগানের নীতি নির্ধারণ করেন তাদের সঙ্গে গ্রাম বা শহর কোথাকারই গরীব মানুষদের কোন সুযোগ থাকেনা । জল লভ্যতার সঙ্গে আদিকাল থেকে ধর্ম-জাত-পাত জল-জঙ্গল ইত্যাদি সমাজকে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে যে উচ্চবর্গ আর ধনী শ্রেণির লোকেরা জলের উৎসকে এমনভাবে দখল করে রেখেছে যে ব্রাত্যজনের সেই জলে ছোঁয়া লাগাও প্রাণসংশয়ী হয়ে ওঠে । আর রাষ্ট্রপরিচালকরাও বড়লোকদের প্রতি এতটাই একদেশদর্শী যে সাংবিধানিক নিরপেক্ষতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কাগজে কলমে দিল্লীর গরীবের জন্য যেখানে মাথাপিছু দৈনিক বরাদ্দ মাত্র ৩৬ লিটার সেখানে সাধারণ বড়লোকের বরাদ্দ ৪০০ লিটার — যত বড় ধনী তার বরাদ্দ তত বেশী । গ্রামের গরীবদের জন্য বরাদ্দের তো কোনও প্রশ্নই নেই । জলসংরক্ষণ , পুনঃসংস্থাপন , পুনর্নবীকরণ ইত্যাদি কাজের চাইতে প্রশাসকরা জলকে ব্যক্তি মালিকানায় আনার ব্যাপারে বেশী উৎসাহী । একটা ক্রমবর্ধমান আত্মবিলাসী সমাজে স্ব-অধিকারে রাখা একটি সুইমিংপুল আর মরুভূমির মাঝখানে হোটেলেও ১২'' মাপের শাওয়ার হেড রাখার বিলাসিতাকে প্রশয় দিতে যেখানে কোন নৈতিক দংশন ব্যবস্থাপকরা বোধ করেনা সেখানে জল ব্যবহারের প্রয়োজনভিত্তক ব্যবস্থাপনার সীমিত পদচিহ্ন আঁকাও খুবই দুরূহকাজ ।

আমরা যদি এই রাজ্যের জল সংকটের দিকে মুখ ফেরাই তাহলে দেখতে পাব একদা জলসিক্ত এই বাংলা , বিশেষ করে তার কৃষি অর্থনীতি আজ জলাভাবে বিপন্ন । একদিকে ভূ-উষ্ণায়ন , অন্যদিকে জল ব্যবস্থাপনায় সরকারের চরম ঔদাসীন্য রাজ্যকে এক গভীর সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে । সরকারী বিজ্ঞাপন থেকেই দেখা যাচ্ছে গ্রামাঞ্চলে ৬৬ শতাংশ বাড়িতেই জলের যোগান নেই । জঙ্গলমহলে এই সংখ্যাটা আরো অনেক বেশী । গত তিন দশকের বেশী সময়কালে রাজ্যের একমাত্র নদী পরিকল্পনা সুবর্ণরেখা সেচ প্রকল্প বহুদিন পর্যন্ত যার কোন কাজের অগ্রগতিই ঘটেনি , রাজ্যে সেচের জল পায় ৩৮% জমি , তাও আবার মূলত মাটির নীচের জল তুলে । মাটির নীচের জল এভাবে ব্যবহারের ফলে প্রকৃতি হয়ে পড়েছে দেউলিয়া , অর্থনীতি এলোমেলো ।

রাজ্যের মোট চাহিদার ৭২% হল সেচের জন্য । পানীয় জলের চাহিদা মাত্র ০.৮২% । এই সামান্য জলও সব মানুষকে দেওয়া যায়নি । এখনও গ্রাম বাংলার বহু মানুষ নদীর বুকের বালি খুঁড়ে পানীয় জল সংগ্রহ করেন । শহরাঞ্চলেও গ্রীষ্মকালে চরম জলসংকট দেখা দেয় । কলকাতার মতো শহরে শতকরা ৩১ ভাগ বাড়িতে জলের কল নেই । কলকাতা শহরে প্রতিদিন যত জল অপচয় হয় তা দিয়ে আরো ১৫ লক্ষ মানুষের চাহিদা মেটানো যায় । জেলাগুলোর মধ্যে যেমন কয়েকটা ক্ষেত্রে -- মেদিনীপুরে ৫১% , দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ৫০% , বীরভূমে ২৭% , মুর্শিদাবাদে ৩৯% , হাওড়ায় ৪৪% বাড়িতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা নেই । রাজ্যের অন্যান্য জেলার অবস্থা প্রায় ঐ একই রকম বা তার চাইতে খারাপ — বিশেষত বাঁকুড়া , পুরুলিয়া ইত্যাদি জেলায় ।

রাজ্যের ৩৪১ টি ব্লকের মধ্যে ১৩০টির মাটির নীচের জল আর্সেনিক বা ফ্লোরাইড বিষাক্ত । এর কবলে প্রায় ২ কোটি মানুষ । এই আর্সেনিক বা ফ্লোরাইড বিষাক্ত জলই সেচের কাজে ব্যবহার হয় এবং খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে ক্রমাগত সেই বিষ আমাদের দেহে ঢুকছে ।

বহু চর্চিত হলেও বৃষ্টির জলসংরক্ষণের কোনও চেষ্টাই হয়নি । শহরাঞ্চলে একের পর এক বহুতলের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে । যথেচ্ছভাবে তোলা হচ্ছে মাটির নীচের জল । বিবাদী বাগ এলাকায় মাটির নীচের জল প্রায় ৪৫ ফুট নেমে গেছে । ছাদের জল সংরক্ষণের কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি । আবার জলাভূমি বুজিয়ে অবাধে চলছে নগরায়ন , যেমন হয়েছে রাজারহাটে ।

রাজ্যের পুকুর , দীঘি ও অন্যান্য জলাভূমিতে ৪২৯৫০ কোটি ঘনমিটার জল জমা হয় । আর ডি ভি সি-র বিভিন্ন জলাধারে জমা হয় ৪১৬৩০ কোটি ঘনমিটার জল । এদেশে জল সংরক্ষণের ঐতিহ্য প্রাচীন , গ্রাম বাংলার মানুষ জানেন কিভাবে জল সংরক্ষণ করতে হয় ,বাংলার প্রায় ১০/১২ লক্ষ পুকুর আছে ; সেগুলোকে সংস্কার করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে । প্রয়োজন শুধু আর্থিক সহযোগিতা আর সমন্বয় । কিন্তু এই কাজে যে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন তা কখনোই কোন সরকার দেয়নি । ১০০ দিনের কাজের কর্মসূচীর সঙ্গে গ্রামে এই ১২ লক্ষ হেজে মজে যাওয়া পুকুর সংস্কারে হাত লাগালে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্ম সংস্থান হতে পারে , বদলে দেওয়া যাবে বাংলার গ্রামীন জলসঙ্কট আর কৃষি অর্থনীতি ।

বহুজাতিক কোম্পানীগুলো মাটির নীচ থেকে যথেচ্ছ পরিমাণ জল তোলার অনুমতি পেয়েছে । এত জল তুলে নেবার ফলে শুকিয়ে গেছে অনেক পুকুর , জলাভূমি ও নদী । বেড়েছে ভূগর্ভের জলে আর্সেনিকের প্রকোপ ।

বহুনদীর জল এখন দূষিত এবং ব্যবহার অযোগ্য । শহর ও শিল্পাঞ্চলের বর্জ্য অবাধে নদীতে ফেলা হয় , যেমন শুধুমাত্র কল্যাণী থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত গঙ্গার অংশে ৩২৪টি নালারদূষিত জল এসে মিশেছে । গঙ্গা এ্যাকশন প্ল্যানে শতশত কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি । দূষণের ফলে হারিয়ে যাচ্ছে নদীর প্রাণী বৈচিত্র্যও । হারিয়ে গেছে বাঙ্গালীর প্রিয় মাছ ইলিশ ।

ভারতের প্রচীনতম সভ্যতার নিদর্শন সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ছিল মহেঞ্জোদরো, হরপ্পার মতোশহরে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী এবং নিকাশি ব্যবস্থা । অথচ স্বাধীনতার ছয় দশক পরেও কলকাতার এক ব্যাপক অংশ সহ রাজ্যের অন্য অনেক শহরে না আছে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী, না আছে উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা । অল্প বৃষ্টিতেই শহরগুলো জলে ডুবে যায় । খাল ও নিকাশি নালাগুলো পলি জমে অবরুদ্ধ । পলি তোলার কাজ চূড়ান্ত অবহেলিত । নিকাশি পথ অবরুদ্ধ হয়ে জল জমার কারণে সবচাইতে দুরবস্থায় পড়েন শহরের প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষেরা । কথায় বলে মরতে মরণ 'বাউস্যার' ।

জলের সঙ্গে কৃষি , খাদ্য উৎপাদন এবং ক্ষুধার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গি । দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা পেতে এবং কৃষি উৎপাদন সুরক্ষিত ও সুনিশ্চিত করতে বেদ-উপনিষদে যেমন জলদেবতার সন্তুষ্টি বিধানে বহু শ্লোক নির্মিত হয়েছিল , তেমনি দেখি আমাদের আদি অর্থনীতিবিদ কৌটিল্য জোর দিয়েছিলেন জল সংরক্ষণের কাজে । এমনকি তিনি জল সংরক্ষণের জন্য জলাধার নির্মাণের কাজে দেশের শাসকের শারীরিক উপস্থিতির পরামর্শও দিয়েছিলেন এই জন্য যাতে প্রজাকুলের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি হয় , রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের কৌশল হিসেবে নয় ।

পৃথিবী ক্রমশ উষ্ণ হচ্ছে , অনেক এলাকায় জল সংকট আরো গভীরহচ্ছে , একই সময় শুরু হয়েছে গরীব দেশগুলো থেকে জলসম্পদ লুঠনের নতুন প্রকৌশল — যার নাম 'ভারচুয়াল ওয়াটার ট্রেড' । আমেরিকা ব্রিটেনের মতো দেশ চাইছে যে , যে সকল ফসল উৎপাদনে বেশি জল লাগে সেগুলোর চাষ হোক ঐ গরীব দেশগুলো , অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বে , তারপর তা রপ্তানি হোক উন্নত দুনিয়ায় । রপ্তানি করে লাভের আশায় তৃতীয় দুনিয়ার শাসকরাও উল্লসিত ,তারা বুঝতে পারেনা যে , প্রতি টন খাদ্যশশ্য রপ্তানির সঙ্গে বিনে পয়সায় কয়েক লক্ষ টন জলও চলে যায় সবার অলক্ষে । যেমন এক টন চাল উৎপাদন করতে লাগে ২৮.৫০ লক্ষ লিটার জল । নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেন যত বড় গলাতেই বলুন যে 'গণতন্ত্রে কোন দুর্ভিক্ষ ঘটেনা' আসলে তা নাকচ হয়ে যায় যখন দেখি যে বহু গণতন্ত্রেই বাস্তবত দুর্ভিক্ষ চলছে , এমনকি পৃথিবীর ধনীতম দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ । কারণ ঐ সব ধনী ,'গণতান্ত্রিক' দেশে অধিক জল ব্যয় সাপেক্ষ খাদ্যে চাষের পরিবর্তে তারা বাজার দখলী পণ্য উৎপাদনে ব্যস্ত — যেমন জৈব তেল । কৃষিকে চোরাপথে শক্তির বাজারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া ।

বাজারের জন্য বাজারের দ্বারা বাজারি গণতন্ত্রের সাহায্যে লুঠ হয়ে যাচ্ছে প্রতিটি প্রাণীর আবির্ভাব কাল থেকে প্রাণের উৎস জল পাবার গণতান্ত্রিক অধিকার । আসুন এই লুঠের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই ।

মানুষের আশা সর্বদা আকাশচুম্বী, জল কিন্তু সর্বদা নীচ দিয়েই বয়ে চলে ।